গোকুল মেধ বগুড়া সদর থানার অন্তর্গত গোকুল গ্রামে খননকৃত একটি প্রত্নস্থল। স্থানীয়ভাবে এটি *বেহুলার বাসর ঘর* নামেই অধিক পরিচিত। তবে আদতে এটি বেহুলার বাসর ঘর নয়, একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ। অনেকে একে *লক্ষ্মীন্দরের মেধও* বলে থাকে।[১] এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

অবস্থান[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ২ কি.মি দক্ষিণ পশ্চিমে গোকুল নামক গ্রাম এবং গোকুল, রামশহর ও পলাশবাড়ি গ্রাম তিনটির সংযোগ স্থলে এটি অবস্থিত।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তররের মতে, আনুমানিক খৃস্টাব্দ ৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে এটা নির্মিত হয়। বলা হয়ে থাকে এখানে বেহুলার বাসর হয়েছিল। যা সেন যুগের অনেক পূর্বেকার ঘটনা। তবে বর্তমান গবেষকদের মতে, এ কীর্তিস্তম্ভ ৮০৯ থেকে ৮৪৭ খৃস্টাব্দে দেবপাল নির্মিত একটি বৌদ্ধমঠ। এখানে বহু গর্তযুক্ত একটি ছোট প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে ষাঁড়ের প্রতিকৃতির একটি স্বর্ণ পত্র পাওয়া গিয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা হয়, এটি একটি বর্গাকৃতির শিব মন্দির ছিলো।[২] বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে এটাকে বৌদ্ধ মঠ রূপে উল্লেখ করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই মেধকে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি নির্মাণ করা হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীকে বাইরের শত্রু থেকে রক্ষা করার জন্য।[৩]

অবকাঠামো[সম্পাদনা]

ইষ্টক নির্মিত এ স্তূপটি পূর্ব পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এখানে ত্রিকোণ বিশিষ্ট ১৭২ টি কক্ষ আছে। এ কক্ষগুলো দেখতে অনেক অস্বাভাবিক এবং এর এলোমেলো নির্মাণশৈলী এর বোধগম্যতাকে আরো দুর্বোধ্য করে তোলে। এই স্তূপটি বাসর ঘর নয়। এই স্তূপটির পশ্চিম অংশে আছে বাসর ঘরের প্রবাদ স্মৃতিচিহ্ন। পূর্ব অংশে রয়েছে ২৪ কোণ বিশিষ্ট চৌবাচ্চাসদৃশ একটি স্নানাগার। উক্ত স্নানাগারের মধ্যে ছিল ৮ ফুট গভীর একটি কূপ। কূপটিতে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর মধুনিশি যাপনের পর কূপের জলে স্নান করে তাতে শুদ্ধতা লাভ করতে সক্ষম হতেন।[৪]

গোবিন্দ ভিটা

গোবিন্দ ভিটা **বাংলাদেশের বৃহত্তর বগুড়াতে অবস্থিত একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি করতোয়া নদীর বাঁকে মহাস্থান দুর্গনগরীর সন্নিকটে উত্তর দিকে অবস্থিত। ১৯২৮-২৯ সালে খনন করা গোবিন্দ ভিটায় দুর্গ প্রাসাদ এলাকার বাইরে উত্তর দিকে অবস্থিত।**[১]

নামকরণ[সম্পাদনা]

গোবিন্দ ভিটা শব্দের অর্থ গোবিন্দ (হিন্দু দেবতা) তথা বিষ্ণুর আবাস। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের কোনো নিদর্শন এ স্থানে পাওয়া যায়নি। তবুও প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে গোবিন্দ ভিটা নামে পরিচিত।[২]

ইতিহাস[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় দুর্গ নগরীর প্রাচীরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত গোবিন্দ ভিটা নামক একটি অসমতল ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে ২০০/১২৫' পরিমাপের একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন হস্তান্তরযোগ্য প্রত্নিনিদর্শণ, ইটের মাপ ব্যবহৃত মসল্লা, স্থাপত্যিক বির্নাস ইত্যাদির ভিত্তিতে অনুমিত হয় যে, মন্দিরটি খ্রীষ্ঠীয় আনুমানিক সাত শতকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটিতে একাধিকবার পুনঃনির্মানের নিদর্শণ লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টীয় ১২শ-১৩শ শতকে রচিত সংস্কৃতি গ্রন্থ ‘‘করতোয়া মহাত্ন্য’’ এ মন্দিরটির কথা উল্লেখ রয়েছে। এটি গোবিন্দ বা বিষ্ণু মন্দির নামে পরিচিত হলেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইনি যার ওপর ভিত্তি করে এটিকে বৈষ্ণব মন্দির বলা যেতে পারে।[৩]

[৩]

প্রাপ্ত নিদর্শন[সম্পাদনা]

এ প্রত্নস্থলে আবিস্কৃত অন্যান্য প্রত্নবস্তুতর মধ্যে ছাঁচে ঢালা তাম্র মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, উত্তর ভারতীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্রের টুকরা, শুঙ্গযুগীয় শিল্প বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পোড়ামাটির ফলক, ব্রাক্ষী হরফ সংবলিত পোড়ামাটির সীল, স্বল্প মূল্যবান পাথর গুটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈরাগীর ভিটা

বৈরাগীর ভিটা বাংলাদেশের বৃহত্তর বগুড়া তে অবস্থিত একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি করতোয়া নদীর বাঁকে মহাস্থান দুর্গনগরীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ১৯২৮-২৯ সালে খনন করা বৈরাগীর ভিটায় দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ উদ্যোগে পুনরায় খনন কাজ পরিচালনা করে আসছে।[১]

নামকরণ[সম্পাদনা]

এই স্থানটি একটি পুরাতন রাজাবাড়ি ছিল বলে ধারণা করা হয়। অনুমান করা হয় রাজা কর্তৃক মুনি, ঋষি বা বৈরাগীর সেবা করা হত বলে স্থানটি নাম বৈরাগীর ভিটা নামে পরিচিত।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় দুর্গ নগরীর প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত বৈরাগীর ভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে পাল আমলের প্রাথমিক ও শেষ যুগের দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দির দুটির উত্তরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আরও কিছু স্থাপত্যকর্ম পাওয়া যায়।[২] প্রাথমিক পাল যুগের মন্দিরটির ভিত্তি প্রাচীর উত্তর দিকে ২৯.৮৭ মিটার ও পূর্ব দিকে ১২.৮ মিটার। প্রাচীরটি মোল্ডেড ব্যান্ড দ্বারা অলঙ্কৃত। এর দক্ষিণ দিকে অপর মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরটিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবহমান একটি নালা বিভক্ত করেছে। নালাটির একটি অংশ ইট দিয়ে নির্মিত

ও আরেকটি অংশ প্রাথমিক গুপ্ত আমলের কালো কষ্টি পাথর দিয়ে নির্মিত। দ্বিতীয় পাল যুগের মন্দিরটি আগেরটি অপেক্ষা বৃহত্তর এবং আয়তাকৃতির (৩৩.৮৩ মি × ১৩.৩৭ মি)। ধ্বংসাবশেষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য এর স্থাপত্যশৈলী স্পষ্ট নয়। মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়, যাতে ২৩টি কামরার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া এই স্থানে লুকিয়ে থাকা গভীর গর্তে পাল যুগের কাঠামো ও তার পূর্ববর্তী গুপ্ত যুগের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[২] ২০১৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে ২১০০ বছর আগের তিনটি পাতকুয়া আবিষ্কার করা হয়।[৩]

প্রাপ্ত নিদর্শন[সম্পাদনা]

এ প্রত্নস্থলে আবিস্কৃত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে মাছ ধরার জালে ব্যবহারের জন্য তৈরি পোড়া মাটির বল, মাটির বদনা, ভাঙা পাত্রের অংশবিশেষ, গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য কিছু সামগ্রী, ফুলাংকিত ও পিরামিড আকারের নকশা করা ইট উল্লেখযোগ্য।[১][৪]

শীলাদেবীর ঘাট

শীলাদেবীর ঘাট বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ২০০ মিটার পূর্বে করতোয়া নদীতে অবস্থিত। এই ঘাটের মূল অবস্থান মহাস্থানগড়ের বৈরাগি ভিটার বিপরীত দিকে। [১]

স্থানীয় কাহিনী অনুযায়ী, শীলাদেবী ছিলেন মহাস্থানগড়ের শেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের বোন বা ভগ্নি। মুসলিম সাধক শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার কর্তৃক রাজা পরশুরাম পরাজিত হবার পর শীলাদেবী করতোয়া নদীর এই স্থানে জলে ডুবে আত্মহুতি দেন। এরপর থেকে স্থানীয় হিন্দুধর্মালম্বীরা এই স্থানে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে এবং ১২ বছর পরপর পৌষ-নারায়ণী স্নানের উদ্দেশ্যে এই স্থানে যোগ দিয়ে থাকেন। দেশে এবং দেশের বাইরের অনেকেই এই স্নানউৎসবে অংশ নিতে করতোয়া তীরে আসেন।[২] অন্য এক জনস্রুতি মতে, স্থানটি এক সময় নৌপথে আমদানি করা পাথর খালাস ও স্তুপীকৃত করে রাখার জন্যে ব্যবহৃত হতো বলে কালক্রমে এর নাম হয় “শিলা দ্বীপ”, এবং যার বিকৃতরূপ সম্ভবত “শীলাদেবী” এবং “শীলাদেবীর ঘাট”।[১]

শাহ সুলতান বলখী

শাহ সুলতান বলখী (ফার্সি: شاه سلطان بلخی)বা **শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার** একাদশ শতাব্দির মুসলিম ধর্ম প্রচারক[১] তিনি পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান বগুড়া জেলা) এবং সন্দ্বীপ ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

অন্য এক সূত্রে জানা যায়, ইতিহাসবিদ প্রভাষ চন্দ্র সেন রচিত ‘বগুড়ার ইতিহাস’ (১৯১২ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে উল্লেখ আছে ১০৪৩ সালে (হিজরী ৪৩৯) রাজা নরসিংহ বা পরশুরাম’কে আফগানিস্তান থেকে আগত ইসলাম ধর্ম প্রচারক সুফী শাহ সুলতান বালখী যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। (সূত্র : ‘Mahasthan’ by Dr. Nazimuddin Ahmed, 1964, Published from Department of Archeology and Museums Ministry of sports and culture, Government of Bangladesh, Dacca)

প্রাথমিক জীবন[সম্পাদনা]

তিনি আফগানিস্তানের বালখ রাজ্যের সম্রাট ছিলেন।[২] তিনি ছিলেন বালখ রাজ্যের সম্রাট শাহ আলী আসগরের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর তাকেই সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয়[৩] কিন্তু তিনি তার সাম্রাজ্য ছেড়ে দরবেশ

হয়েছিলেন, ৪৪০ হিজরীতে তিনি পুন্ড্রবর্ধনে আসার আগে প্রথমে বাংলার সন্দ্বীপে পৌছেন। পরে তিনি মহাস্তান গড়ে (পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী) আসেন।[২]

পুন্ড্রবর্ধন জয়

সুলতান বলখী ১৪শ শতাব্দীতে পুন্ড্রবর্ধনের রাজা পরশুরামকে পরাজিত করে পুন্ড্রবর্ধন জয় করেন[১] অন্য একটি উৎস থেকে জানা যায় তিনি ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা পরশুরামকে পরাজিত করেন[৪] পরশুরাম ছিলেন পন্ড্রবর্ধনের শেষ রাজা[৫] কথিত আছে শাহ সুলতান তার শীষ্যদের নিয়ে ফকিরবেশে একটি মাছ আকৃতির নৌকাতে করে মহাস্থানগড় এসেছিলেন সেখান থেকে তার নাম এসেছে মাহিসাওয়ার[৬] (মাছের পিঠে করে আগমণকারী) এবং তিনি বলখ থেকে এসেছিলেন সেজন্য তাকে শাহ সুলতান বলখী ও বলা হয়। মহাস্থানগড় পৌছে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, প্রথমে রাজা পরশুরামের সেনাপ্রধান, মন্ত্রি এবং কিছু সাধারণ মানুষ ইসলামের বার্তা গ্রহণ করে মুসলিম হয়, এভাবে পুন্ড্রবর্ধনের মানুষ হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলে রাজা পরশুরামের সাথে শাহ সুলতানের বিরোধ বাধে এবং এক সময় যুদ্ধ শুরু হয়, যুদ্ধে রাজা পরশুরাম পরাজিত এবং মৃত্যু বরন করেন।[৪] বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে রাজার মেয়ে রাজকন্যা শিলাদেবী করতোয়া নদীতে ডুবে মরেন। তার ডুবে যাওয়ার আশেপাশের অঞ্চলটি শিলা দেবীর ঘাট হিসাবে পরিচিত।[৭]

উত্তরাধিকার

বালখী কীভাবে এবং কখন মারা গিয়েছিল তা অজানা। ১৬৮৫ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বলখীর দরগা ভাড়ামুক্ত জমি ছিল এবং সৈয়দ মুহাম্মদ তাহির, সৈয়দ আবদুর রহমান এবং সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাকে সনদ জারি করা হয়েছিল। বালখীর মাজারে গেট প্রবেশের নাম *বুড়ি কা দরজা* যা মুঘলরা তৈরি করে। ১৭১৯ সালে সম্রাট ফররুখসিয়রের রাজত্বকালে খোদাদিল মাজারের নিকটে একটি বৃহত একক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা আজও প্রচলিত রয়েছে।[৮]

খোদার পাথর ভিটা

পাথর নির্মিত চৌকাঠের ধ্বংসাবশেষ

খোদার পাথর ভিটা মাজারের পূর্বে পাহারে অবস্থিত। আয়তাকার এই বৌদ্ধ মন্দিরটি ছিল পূর্বাভিমুখী। এটি দীর্ঘাকার এবং চৌকাণাকৃতির মর্সণ পাথর যা সাধারণত প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, রাজা পরশুরাম এটি সংগ্রহ করে মসৃণ করে বলী দেয়ার কাজে ব্যবহার করতেন। হিন্দু রমণীগণ এ পাথর দুধ ও সিঁদুর দিয়ে স্নান করাতো। এখনো কেউ কেউ নগ্ন পায়ে এই চৌকাঠটিতে দুধ ঢেলে ভক্তি নিবেদন করেন।

এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ পাল শাসনামলের প্রথম দিকের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় আট শতক) বলে জানা গেছে। ১৯৭০ সালে এ ঢিবি বা ভিটাতে খননকার্য করে একটি মন্দির এবং তার সাথে ছোটখাটো কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ঢিবির উপরিভাগে গ্রানাইট পাথরের একটি বিশাল চৌকাঠ পাওয়া যায় এবং এ থেকেই স্থানীয় জনগণ ঢিবির এমন অদ্ভুত নামকরণ করেছে। এখানে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত খোদাইকৃত প্রস্তর খন্ডগুলির মধ্যে একই সারিতে আসীন অবস্থায় তিনটি বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। যা বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। এখনও মাটির নিচে চাপা পড়া অবস্থায় আছে প্রত্নস্থলটির কাঠামোর ধংসাবশেষ। শুধু বিশাল চৌকাঠটি এখানে দেখা যায়।

মহাস্থানগড়

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। প্রসিদ্ধ এই নগরী ইতিহাসে **পুণ্ড্রবর্ধন** বা **পুণ্ড্রনগর** নামেও পরিচিত ছিল।[১][২][৩] এক সময় মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এখানে সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবেই তার প্রমাণ মিলেছে। ২০১৬ সালে এটিকে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৪][৫]

প্রাচীর বেষ্টিত এই নগরীর ভেতর রয়েছে বিভিন্ন আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ স্থান মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন শাসকবর্গের প্রাদেশিক রাজধানী ও পরবর্তীকালে হিন্দু সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছিল। তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য হিন্দু রাজা ও অন্যান্য ধর্মের রাজারা রাজত্ব করেন। মহাস্থানগড়ের অবস্থান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় ।[৩] বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে গেলে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নগরী। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে এটি পুণ্ড্র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ছিল।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৯ থেকে ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পুন্ড্রনগরে এসেছিলেন। ভ্রমণের ধারাবিবরণীতে তিনি তখনকার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ করে বর্ণনা দেন। বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ হওয়ায় চীন ও তিব্বত থেকে ভিক্ষুরা তখন মহাস্থানগড়ে আসতেন লেখাপড়া করতো এরপর তারা বেরিয়ে পড়তেন দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। সেখানে গিয়ে তারা বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার বিস্তার ঘটাতেন।[৬]

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন (১০৮২-১১২৫) যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন এই গড় অরক্ষিত ছিল। মহাস্থানের রাজা ছিলেন নল যার বিরোধ লেগে থাকত তার ভাই নীল এর সাথে।
এসময় ভারতের দাক্ষিণাত্যের শ্রীক্ষেত্র নামক স্থান থেকে এক অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ এখানে আসেন। তিনি রাজা পরশুরাম । এই রাজা পরশুরাম রাম নামে ও পরিচিত ছিলেন

ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে আসেন ফকির বেশি দরবেশ হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র:) এবং তার শীষ্য। ধর্ম প্রচারক শাহ্ সুলতান বলখী সম্পর্কে রয়েছে আশ্চর্য কিংবদন্তি।[৭] কথিত আছে, তিনি মহাস্থানগড় অর্থাৎ প্রাচীন পুন্ড্রনগরে প্রবেশ করার সময় করতোয়া নদী পার হয়েছিলেন একটা বিশাল মাছের আকৃতির নৌকার পিঠে চড়ে।

ভূগোল[সম্পাদনা]

পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের অবস্থান বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার(৬.৮ মাইল) উত্তরে বগুড়া রংপুর মহাসড়কের পাশে। মনে করা হয় এখানে শহর পত্তনের মূল কারণ এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম উচ্চতম অঞ্চল। এখানের ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৬ মিটার (১১৮ ফুট) উঁচু, যেখানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৬ মিটার (২০ ফুট) উঁচু। এছাড়া এই স্থানটি বেছে নেওয়ার আরেকটি কারণ হল করতোয়া নদীর অবস্থান ও আকৃতি। নদীটি ১৩ শতকে বর্তমান গঙ্গা নদীর তিনগুণ বেশি প্রশস্ত ছিল।[৮] মহাস্থানগড় বরেন্দ্র অঞ্চলের লাল মাটিতে অবস্থিত যা পলিগঠিত অঞ্চল হতে কিছুটা উঁচু। ১৫-২০ মিটার উপরের অঞ্চলগুলোকে বন্যামুক্ত ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল বলে ধরা যায়।[৯]

আবিষ্কার[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত ও উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অবদান রয়েছে। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন প্রথম মহাস্থানগড়ের অবস্থান চিহ্নিত করেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম এই প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীকে পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানীরূপে চিহ্নিত করেন। অনেক পর্যটক ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষত সি. জে. ও'ডোনেল, ই. ভি. ওয়েস্টম্যাকট ও হেনরী বেভারীজ এই শহরতলি এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সন্ধান মেলে ব্রাহ্মী লিপির। সেই লিপিতে পুণ্ড্রনগরের প্রাদেশিক শাসক সম্রাট অশোক দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে রাজভান্ডার থেকে খাদ্যশস্য ও অর্থ সহায়তা প্রদানের নির্দেশ

দেন। এসব তথ্য উপাত্ত থেকে প্রসিদ্ধ এই নগরীর প্রাচীনতমের প্রমাণ মেলে। এখানে তীরের ফলাও পাওয়া যায়।

দুর্গস্থাপনা[সম্পাদনা]

প্রাচীন শহরের কেন্দ্রেস্থিত দুর্গটি উপর থেকে দেখতে আয়তাকার ছিল যা উত্তর-দক্ষিণে ১.৫২৩ কিলোমিটার (০.৯৪৬ মাইল) ও পূর্ব-পশ্চিমে ১.৩৭১ কিলোমিটার (০.৮৫২ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রতি পাশে উঁচু ও প্রশস্ত সুরক্ষা প্রাচীর ছিল। দুর্গের আয়তন প্রায় ১৮৫ হেক্টর।[৮] এককালের প্রশস্তা নদী করতোয়া এর পূর্বপার্শ্বে প্রবাহিত হত।[২] ১৯২০ সাল পর্যন্ত খননকার্যের পূর্বে দুর্গের উচ্চতা আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে ৪ মিটার বেশি ছিল এবং বেশ কয়েকটি উঁচু মাটির আস্তরে দাগাঙ্কিত ছিল। রক্ষাপ্রাচীরটি কাদামাটির তৈরি প্রাচীরের মতো দেখতে যা বহু স্থানে বলপূর্বক ভাঙার চেষ্টা দেখা যায়। প্রাচীরটি আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে ১১-১৩ মিটার (৩৬-৪৩ ফুট) উঁচু। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি মাজার ছিল। এছাড়া পরবর্তীকালের (১৭১৮-১৯) নির্মিত একটি মসজিদও রয়েছে। বর্তমানে দুর্গের ভিতরে কয়েকটি ঢিবি ও নির্মাণ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে জিয়ত কুণ্ড (একটি কূপ যাতে জীবন প্রদানের শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়), মানকালীর ধাপ(মানকালীর পবিত্র স্থান),পরশুরামের বাসগৃহ (রাজা পরশুরামের প্রাসাদ), বৈরাগীর ভিটা (সন্ন্যাসিনীদের আখড়া), খোদার পাথর ভিটা (ঈশ্বরকে অর্পিত প্রস্তরখণ্ড), মুনির ঘোন (একটি ক্‌ল্‌লো) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রবেশদ্বার রয়েছে যেমন কাঁটা দুয়ার (উত্তরে), দোরাব শাহ তোরণ (পূর্বে), বুড়ির ফটক (দক্ষিণে), তাম্র দরজা (পশ্চিমে)।[২] উত্তর-পূর্ব কোণে কয়েকটি ধাপ (পরে সংযুক্ত) রয়েছে যা জাহাজঘাটা পর্যন্ত গিয়েছে। জাহাজঘাটার কিছুটা সামনে করতোয়া নদীর তীরে গোবিন্দ ভিটা (গোবিন্দের মন্দির) অবস্থিত। এর সামনে স্থানীয় জাদুঘর রয়েছে যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। এর পাশে একটি রেস্ট হাউজ রয়েছে।

নগরের অবকাঠামো[সম্পাদনা]

দুর্গকাঠামো ছাড়াও সেখানে প্রায় শখানেক ঢিবি ৯ কি.মি. ব্যাসার্ধের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

খননকৃত ঢিবি[২]

- গোবিন্দ ভিটা, দুর্গের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি মন্দির
- খুল্লনার ধাপ, একটি মন্দির
- মঙ্গলকোট, মহাস্থানগড় জাদুঘর থেকে ১.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ বা দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি মন্দির।[১০]
- গদাইবাড়ি ধাপ, খুল্লনার ধাপ থেকে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি মন্দির
- তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ, দুর্গের ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি আশ্রম
- নরপতির ধাপ (ভাসু বিহার), তোতারাম পণ্ডিতের ধাপ হতে ১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একগুচ্ছ আশ্রম
- গোকুল মেধ, (লখীন্দরের বাসরঘর), দুর্গের তিন কিলোমিটার দক্ষিণে একটি মন্দির
- স্কন্ধের ধাপ, গোকুল মেধের ২ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে একটি মন্দির
- বৈরাগীর ভিটা, ১৯২৮-২৯ সালে খনন করা বৈরাগীর ভিটায় দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

প্রধান অখননকৃত ঢিবি[২]

- শীলাদেবীর ঘাট
- চুনোরু দিঘি ধাপ
- কৈবিল্কি ধাপ
- ধনিকের ধাপ
- মন্দিরির দরগাহ
- বিষমর্দন ঢিবি
- রাসতলা ধাপ
- শশীতলা ধাপ
- চাঁদের ধাপ

- জুরাইনতলা
- পরশুরামের শোভাবাতি
- বলাই ধাপ
- প্রচীর ঢিবি
- কাঞ্জির হাড়ি ধাপ
- লহনার ধাপ
- খোজার ঢিবি
- দোলমঞ্চ ঢিবি
- মলিনার ধাপ
- মলপুকুরিয়া ধাপ
- যোগীর ধাপ
- পদ্মবতীর ধাপ
- কানাই ধাপ
- দুলু মাঝির ভিটা
- পদ্মার বাড়ি
- ওঝা ধন্বন্তরির ভিটা
- সিন্ধিনাথ ধাপ
- শালিবাহন রাজার কাচারিবা
- ধনভাণ্ডার ঢিবি
- কাঁচের আঙ্গিনা
- মঙ্গলনাথের ধাপ
- ছোট টেংরা/ বাবুর ধাপ/ কে
- সন্ন্যাসীর ধাপ
- দশহাতিনা ধাপ

খননকার্য[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড়ের প্রথাগত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কে. এন. দীক্ষিত এর তত্ত্বাবধানে ১৯২৮-২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শুরু করা হয়। তখন জাহাজঘাটার আশেপাশে মুনির ঘোন আর বৈরাগীর ভিটা পরিদর্শন করা হয়। বৈরাগীর ভিটা আর গোবিন্দ ভিটায় ১৯৩৪-৩৬ খ্রিষ্টাব্দে খননের কাজ স্থগিত করা হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সন্ধান মেলে ব্রাহ্মী লিপির। সেই লিপিতে পুণ্ড্রনগরের প্রাদেশিক শাসক সম্রাট অশোক দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে রাজভান্ডার থেকে খাদ্যশস্য ও অর্থ সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাজার, পরশুরামের প্রাসাদ, মানকালীর ধাপ, জিয়ৎ কুণ্ড ও উত্তরপাশের প্রাচীরের নিকটে খননকাজ চালানো হয়। পূর্ব ও উত্তরপাশের রক্ষাপ্রাচীরে পরবর্তীধাপের খননকাজ বিক্ষিপ্তভাবে চালানো হয় যদিও তখনও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।[১১]

এসব উৎখননের প্রাথমিক প্রতিবেদন ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রায় দু'দশক পর ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে খননকাজ পুনরায় শুরু করা হয় এবং ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই খননকাজ চলতে থাকে। এ সময় খননকাজ মাজারের নিকটবর্তী এলাকা এবং উত্তর ও পূর্ব দিকের রক্ষা-প্রাচীর সংলগ্ন অংশে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ পর্যায়ে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ এলাকাটির বিশালত্বের তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল। এ স্থানটির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অনুক্রম এখনও অজ্ঞাত। এ প্রত্নস্থল ও অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠন এবং প্রাচীন নগরটির সংগঠন সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য একটা ব্যাপক অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল ধরে অনুভূত হচ্ছিল। ফলে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির (১৯৯২) অধীনে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলাদেশী ও ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিকবিদগণ একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন থেকে পূর্ব দিকের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের মধ্যভাগ সন্নিহিত স্থানে প্রতিবছর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কাজ পরিচালিত হতে থাকে। ইতঃপূর্বে সুরক্ষিত নগরের বাইরে ভাসুবিহার, বিহার ধাপ, মঙ্গলকোট ও গোদাইবাড়ির ন্যায় কয়েকটি স্থানেও বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননকার্য পরিচালিত হয়েছে। নগরটিতে উৎখননকালে কয়েকটি স্থানে প্রত্নস্থলের মূল মাটি পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। এর মধ্যে ফ্রান্স-বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক উৎখনন ১৮টি নির্মাণ স্তর উন্মোচন করেছে। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি (ফ্রান্স-বাংলাদেশ উদ্যোগসহ) বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত উৎখননের ফলে নিম্নবর্ণিত সাংস্কৃতিক অনুক্রম উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রথম যুগ: এ পর্যায়ে রয়েছে প্রাক-মৌর্য সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে খ পর্যায়ের বিপুল পরিমাণ উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ পাত্র, রুলেটেড পাত্র, কালো ও লাল রঙের পাত্র, কালো প্রলেপযুক্ত পাত্র, ধূসর বর্ণের পাত্র, পাথরের যাতা, মাটির তৈরি মেঝেসহ মাটির ঘর (রান্নাঘর), চুলা এবং খুটির গর্ত। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ পাত্র সর্বনিম্ন স্তরে অধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে থালা, কাপ, গ্লাস এবং গামলা প্রধান। এ স্তরে অত্যন্ত সীমিত এলাকায় একটি ইট বিছানো মেঝে পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মেঝের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন দেয়াল পাওয়া যায়নি। সম্ভবত প্লাইস্টোসিন ভূভাগের উপর এখানে সর্বপ্রথম বসতি গড়ে উঠেছিল। এর উপরের বসতি স্তরের তেজস্ক্রিয় কার্বন তারিখ পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের শেষ ভাগ। এ থেকে ধারণা

করা যায়, এ স্তরের বসতি প্রাক-মৌর্য যুগের। এই আদি বসতি স্তর নন্দ বা প্রায় ঐতিহাসিক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত কিনা তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যুগ: এ যুগে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের মধ্যে রয়েছে ভাঙ্গাঁ টালি (জানামতে এ ধরনের ছাদের জন্য ব্যবহৃত টালির প্রাচীনতম নিদর্শন), মাটির দেয়াল নির্মাণে মিশ্রণ বা বন্ধনের জন্য ব্যবহৃত ইটের টুকরা (মাঝে মাঝে গৃহস্থালি কাজেও যেমন চুলার স্থান, পোড়ামাটির পাতকূয়া), উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণপাত্র, ঈষৎ লাল বা ঈষৎ হলুদ রঙের সাধারণ পাত্র, রিং স্টোন, ব্রোঞ্জের আয়না, ব্রোঞ্জের প্রদীপ, ছাচ ঢালা মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র, পোড়ামাটির জীবজন্তু, অর্ধমূল্যবান পাথরের গুটিকা বা পুঁতি এবং পাথরের যাতা। কয়েকটি তেজস্ক্রিয় কার্বন তারিখ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৬-১৬২, ৩৭১-১৭৩ অব্দ) এবং সাংস্কৃতিক দ্রব্য এ পর্যায়কে মৌর্য যুগের অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয় যুগ: এ যুগ মৌর্যোত্তর (শূঙ্গ-কুষাণ) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এ যুগে বৃহদায়তনের ও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সংরক্ষিত ইটের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ, ইট বিছানো মেঝে, খুঁটির গর্ত, পোড়ামাটির পাতকূয়া, শূঙ্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রচুর পোড়ামাটির ফলক, অর্ধমূল্যবান পাথরের (এ্যাগেট কার্নেলিয়ন, কোয়ার্টজ) পুঁতি, সুর্মা লাগানোর দন্ড, ছাপাংকিত রৌপ্য মুদ্রা, রূপার বালা, ঢালাই করা তাম্র মুদ্রা, পোড়ামাটির মন্দির চূড়া, ঈষৎ লাল বা হলুদ রঙের প্রচুর পরিমাণ সাধারণ পাত্র (বিশেষত থালা, কাপ, গামলা) এবং ধূসর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। মোটা বুননের উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ পাত্র মৌর্যস্তরের তুলনায় এ স্তরে কম। কয়েকটি তেজস্ক্রিয় কার্বনের ক্রমাঙ্ক স্তর হলো খ্রিস্টপূর্ব ১৯৭-৪৭ অব্দ, খ্রিস্টপূর্ব ৬০ অব্দ-১৭২ খ্রিষ্টাব্দ, খ্রিস্টপূর্ব ৪০ অব্দ-১২২ খ্রিষ্টাব্দ।

চতুর্থ যুগ: এ সময়ে কুষাণ-গুপ্ত যুগের নিদর্শনাদি উন্মোচিত হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ কুষাণ মৃৎপাত্রের টুকরা এবং সমসাময়িক কালের সুনির্দিষ্ট শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রচুর পোড়ামাটির ফলকচিত্র এ যুগের আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদ। মৃৎপাত্রের প্রধান ধরন হলো খোদাই করা নকশাসহ হাতলওয়ালা রান্নার পাত্র, পিরিচ, গামলা, পিচকারি এবং ঢাকনি। উপরের এবং নিচের স্তরের তুলনায় স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ এ অংশে কম। স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে আছে ভাঙ্গা ইটের টুকরা। অন্যান্য সাংস্কৃতিক সামগ্রী হলো পোড়ামাটির গুটিকা বা পুঁতি, গামলা, পাথর এবং কাঁচের গুটিকা বা পুঁতি, কাঁচের চুড়ি এবং পোড়ামাটির সিলমোহর।

পঞ্চম যুগ: এ যুগ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের পরিচয় বহন করে। তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে ৩৬১ থেকে ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ক্রমাঙ্কিত তারিখ নির্দেশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে দুর্গ-নগরীর সন্নিকটে পরবর্তী গুপ্তযুগের গোবিন্দ ভিটা নামে পরিচিত মন্দিরের ইটনির্মিত বিশাল কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ এবং নগরে ইটের তৈরী ঘরবাড়ি, মেঝে ও রাস্তার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও রয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির পোড়ামাটির ফলক, সিলমোহর, কাঁচ ও প্রায়-মূল্যবান পাথরের গুটিকা বা পুঁতি, পোড়ামাটির গোলক ও চাকতি, তামা ও লোহার দ্রব্য এবং ছাপ দিয়ে নকশা করা পাত্রসহ বিপুলসংখ্যক প্রত্নসম্পদ।

ষষ্ঠ যুগ: এ যুগটি নগরের পূর্ব দিকে খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুন্ড ধাপ, পরশুরামের প্রাসাদ ও বৈরাগীর ভিটার ন্যায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পাল যুগের পরিচয় বহন করে। এ পর্যায়টি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং এ যুগে নগরের বাইরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ইমারত নির্মিত হয়েছিল।

সপ্তম যুগ: মানকালীর কুন্ডে পূর্ববর্তী যুগের ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত ১৫ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, ফররুখসিয়ার কর্তৃক নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং চীনা সেলাডন ও এ যুগের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চকচকে মাটির পাত্রের ন্যায় অপরাপর প্রত্ননিদর্শন দ্বারা মুসলিম যুগের পরিচয় বহন করে। নগরের অভ্যন্তরভাগে বৈরাগীর ভিটা, খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর ঢিবি, পরশুরামের প্রাসাদ ঢিবি ও জিয়ৎ কুণ্ড প্রভৃতি প্রত্নস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব প্রত্নস্থল ছাড়াও

১৯৮৮-৯১ সালে খননকার্যের ফলে নগরটির তিনটি প্রবেশদ্বার, উত্তর ও পূর্ব দিকের রক্ষা-প্রাচীরের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং মাযার এলাকার নিকটে একটি মন্দির-স্থাপনা উন্মোচিত হয়েছে।

মহাস্থান প্রত্নস্থলের তিনটি প্রবেশদ্বারের দুটি উত্তর দিকের রক্ষা-প্রাচীরে অবস্থিত। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণের ৪৪২ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি প্রবেশদ্বার ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৫.৮ মিটার দীর্ঘ। অন্যটি ৬.৫ মিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ১.৬ মিটার প্রশস্ত। প্রবেশদ্বার দুটি প্রাথমিক ও পরবর্তী পালযুগ দুপর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। পূর্ব দিকের রক্ষা-প্রাচীরের একমাত্র প্রবেশদ্বারটি প্রায় এর মধ্যস্থলে এবং পরশুরামের প্রাসাদের ১০০ মিটার পূর্বে অবস্থিত এবং প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত। পাল যুগের শেষের দিকে একটি পুরানো প্রবেশদ্বারের ধ্বংসাবশেষের উপর এটি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এ প্রবেশদ্বারটি এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা যায়নি। সবগুলি প্রবেশদ্বার-স্থাপনায় ভেতর দিকে প্রহরি-কক্ষ এবং রক্ষা-প্রাচীরের বাইরে সম্প্রসারিত বুরুজ রয়েছে।

মাজার এলাকায় উন্মোচিত মন্দির-স্থাপনায় কোন সুসঙ্গত নির্মাণ পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না। পাল শাসনামলে এটি পাঁচটি পর্যায়ে নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ এলাকা থেকে উদ্ধারকৃত প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বড় আকারের পোড়ামাটির ফলক, খেলনা ও গোলক এবং অলঙ্কৃত ইট ও মাটির পাত্র।

নগরের রক্ষা-প্রাচীরটি ছয়টি পর্যায়ে নির্মিত। সর্বপ্রাচীন পর্যায়ে সম্ভবত মৌর্যযুগ এবং পরবর্তী পর্যায় শূঙ্গ-কুষাণ, গুপ্ত, প্রাথমিক পাল, পরবর্তী পাল ও সুলতানি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। এই প্রাচীরগুলি পর্যায়ক্রমে একটির উপর অন্যটি নির্মিত হয়েছে। কাজেই নগরের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমিক সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা প্রাচীরেও নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক স্তর পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য প্রাচীনতম স্তরে নগরটির সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীনতম রক্ষা-প্রাচীরের পারস্পরিক সম্পর্ক এখনও নির্ণয়সাপেক্ষ।

গোবিন্দ ভিটা, লক্ষ্মীন্দরের মেধ, ভাসুবিহার, বিহার ধাপ, মঙ্গলকোট ও গোদাইবাড়ি ধাপ নগরটির বাইরে সন্নিহিত এলাকায় খননকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা। কিন্তু সন্নিহিত গ্রামসমূহে আরও অনেক স্তূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যেখানে প্রাচীন সুরক্ষিত পুন্ড্রনগরের উপকণ্ঠের সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

দর্শনীয় স্থান[সম্পাদনা]

মহাস্থান গড় বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রাচীন পর্যটন কেন্দ্র। এখানে বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে মহাস্থানগড়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

দর্শকদের জন্য জ্ঞাতব্য[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় বগুড়া থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে বগুড়া-ঢাকা বিশ্বরোডের পাশে অবস্থিত। পাশেই করতোয়া নদীর একটি ক্ষীণকায় স্রোতধারা প্রবহমান। রাস্তাটি জাহাহঘাটা ও জাদুঘর অবধি গিয়েছে। ঢাকা থেকে সরাসরি যাওয়ার বাস রয়েছে এবং যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর উপর দিয়ে যেতে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে।[১২] ভাড়া গাড়িতে ভ্রমণ করলে একই পথে পুনরায় চলে আসা যায়, অথবা কেউ চাইলে সেখান থেকে নওগার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার পরিদর্শনে যেতে পারেন।

মাজার শরীফ[সম্পাদনা]

শাহ সুলতান বলখী মাহিসাওয়ারের মাজার শরীফ

অনেক ঐতিহাসিক এবং স্থানীয় লোকের মতে এটি হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (র:) এর মাজার। মহাস্থান বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা পশ্চিমে এ মাজার শরীফ অবস্থিত। শাহ সুলাতান বলখী (র:) ১৪শ শতাব্দির

একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন।[৭] কথিত আছে মাছ আকৃতির নৌকাতে করে তিনি তার শীষ্যদের নিয়ে বরেন্দ্র ভূমিতে আসেন। সেখান থেকে তার নাম এসেছে মাহিসাওয়ার (মাছের পিঠে করে আগমণকারী) এবং তিনি বল্লখ রাজ্যের রাজার পুত্র ছিলেন বিধায় তাকে শাহ সুলতান বলখী ও বলা হয়।

১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব সৈয়দ রেজা, সৈয়দ তাহির, সৈয়দ আব্দুর রাহ্মান (তিন ভাই) কে এই মাজারকে জামিনদার দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন। স্থানীয় লোকজন শাহ সুলতান মাহিসওয়ারকে খুব শ্রদ্ধা করে। ধর্মপ্রান হাজারো মুসলমান তাদের নানা সমস্যার সমাধান ও মানত করতে এই মাজারে আসেন।

জাদুঘর[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থান

বগুড়া থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তরে এবং মহাস্থানগড় থেকে সামান্য উত্তরে গোবিন্দ ভিটার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। প্রথম দিকে ৩ একর জায়গার উপর জাদুঘরের মূল অংশটি থাকলে নানা সময়ে সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে এর পরিধি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ একরে।

মহাস্থান গড় খননের ফলে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের হাজার বছরের পুরানো অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন সোনা, রুপা, লোহা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঁসাসহ বিভিন্ন মূল্যবান ধাতব পদার্থ, পোড়ামাটির তৈরি মূর্তি, কালো পাথরের মূর্তি, বেলে পাথরের মূর্তি, মাটি দিয়ে তৈরি খোদাই করা ইট, স্বর্ণবস্তু, বিভিন্ন শিলালিপি, আত্মরক্ষার জন্য ধারালো অস্ত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র ও নানা ধরনের প্রাচীন অলংকারসহ ইত্যাদি সামগ্রী পাওয়া গেছে যা মহাস্থানগড়ের উত্তরে অবস্থিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মহাস্থান গড় ছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত আছে।[১৩]

মানকালীর ঢিবি[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: মানকালীর ঢিবি

আজীবক ধর্ম প্রচারক মোক্ষালি গোসালের নির্মিত হয় এই মন্দির। এটি মহাস্থানগড়ের মজা পুকুরের পূর্ব পারে অবস্থিত। ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্বাবধানে এখানে খননকাজ শুরু হয় ও শেষ পর্যন্ত সুলতানী আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষসহ বেশ কিছু ছোট ছোট প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কার করা হয়। মসজিদটির আয়তন ২৬.২১ থেকে ১৪.৫৪ মিটার। খনন কাজ চলার সময় মসজিদের নিচে একটি মন্দিরেরও কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। মসজিদটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি তবে মসজিদের অবকাঠামো দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ধারণা করেন এটি খুব সম্ভবত মুঘল আমলের পূর্বেই নির্মাণ করা হয়েছিল। কিংবদন্তি অনুসারে, এই স্থানে প্রথমে একটি মন্দির নির্মাণ করেন রাজা মানসিংহ ও তার ভাই তানসিংহ। অন্যান্য কিংবদন্তি অনুসারে, এখানে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন ঘোড়াঘাটের জমিদারগণ। এছাড়াও এখানে পাওয়া জৈন প্রতিমা দেখে অনেকেই মনে করেন পূর্বে জৈন ধর্মগুরুদের আবাসস্থল ছিলো স্থানটি।

বৈরাগীর ভিটা[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: বৈরাগীর ভিটা

মহাস্থানগড় এর উত্তর-পূর্ব কোনে রাজা পরশুরামের বাড়ি হতে প্রায় ২০০ গজ দূরে অবস্থিত। এই স্তূপটির আয়তন ৩০০*২৫০ ফুট।

স্কন্ধের ধাপ[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: স্কন্ধের ধাপ

এটি একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে পাকা সড়কের প্রায় ৫০ মিটার পুবে একটি জলাশয়ের পাশে এই ধাপ অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় সাত শতকে কলহন নামে পণ্ডিতের

রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে পুণ্ড্রনগরে একটি কার্তিকের মন্দির ছিল বলে জানা যায়। ধরনা করা হয় স্কন্দের ধাপের এই মন্দিরটি হল কার্তিকের মন্দির। উৎখনন করার কারণে ঢিবির অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

মঙ্গলকোট স্তুপ[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: মঙ্গলকোট

মহাস্থান গড় হতে ১ কি:মি: পশ্চিমে অবস্থিত।

গোকুল মেধ[সম্পাদনা]

গোকুল মেধ

মূল নিবন্ধ: গোকুল মেধ

মহাস্থানগড় হতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ২ কি:মি: দূরে অবস্থিত।

ট্যাংরা বৌদ্ধ স্তুপ[সম্পাদনা]

প্রায় ৪৫ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট এই স্তুপ ট্যাংরা নামক স্থানে অবস্থিত।

বিহার ধাপ[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: বিহার ধাপ

মহাস্থানগড় হতে ৬ কি:মি: উত্তর পশ্চিম অবস্থিত। স্তুপটি ৭০০*৬০০ ফুট আয়তন।

ভিমের জঙ্গল[সম্পাদনা]

মহাস্থানগড় এর তিন দিক পরিবেষ্টিত এবং অসংখ্য কালোত্তীর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনা সমৃদ্ধ এই ভিমের জঙ্গল।

কালীদহ সাগর[সম্পাদনা]

গড়ের পশ্চিম অংশে রয়েছে ঐতিহাসিক কালীদহ সাগর এবংগড়ের পশ্চিম অংশে রয়েছে ঐতিহাসিক কালীদহ সাগর এবং পদ্মাদেবীর বাসভবন।কালীদহ সাগর সংলগ্ন ঐতিহাসিক গড় জড়িপা নামক একটি মাটির দুর্গ রয়েছে। প্রাচীন এই কালীদহ সাগরে প্রতিবছরের মার্চ মাসে হিন্দু ধর্মালম্বীদের বারুন্নী স্নান অনুষ্ঠিত হয়। স্নান শেষে পুণ্যার্থীগণ সাগরপাড়ে গঙ্গাপূজা ও সংকীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

শীলাদেবীর ঘাট[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: শীলাদেবীর ঘাট

গড়ের পূর্বপাশে রয়েছে করতোয়া নদী এর তীরে ‘শীলাদেবীর ঘাট’। শীলাদেবী ছিলেন পরশুরামের বোন। এখানে প্রতি বছর হিন্দুদের স্নান হয় এবং একদিনের একটি মেলা বসে।

জিয়ৎ কুন্ড[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: জিয়ৎ কুন্ড

এই ঘাটের পশ্চিমে জিয়ৎ কুণ্ড নামে একটি বড় কুপ রয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।[১৪] কথিত আছে এই কুপের পানি পান করে পরশুরামের আহত সৈন্যরা সুস্থ হয়ে যেত। যদিও এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায়নি।

বেহুলার বাসর ঘর[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: গোকুল মেধ

মহাস্থানগড় বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ২কি.মি দক্ষিণ পশ্চিমে একটি বৌদ্ধ স্তম্ভ রয়েছে যা সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। স্তম্ভের পূর্বার্ধে রয়েছে ২৪ কোন বিশিষ্ট চৌবাচ্চা সদৃশ একটি গোসল খানা। এটি বেহুলার বাসর ঘর নামেই বেশি পরিচিত।[১৫]

গোবিন্দ ভিটা[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: গোবিন্দ ভিটা

মহাস্থানগড় জাদুঘরের ঠিক সামনেই গোবিন্দ ভিটা অবস্থিত। গোবিন্দ ভিটা শব্দের অর্থ গোবিন্দ (হিন্দু দেবতা) তথা বিষ্ণুর আবাস। এ ভিটা একটি খননকৃত প্রত্নস্থল, ১৯২৮-২৯ সালে খনন করে গোবিন্দ ভিটায় দুর্গ প্রাসাদ এলাকার বাইরে উত্তর দিকে অবস্থিত। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের কোনো নিদর্শন এ স্থানে পাওয়া যায়নি। তবুও প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে গোবিন্দ ভিটা নামে পরিচিত।

ভাসু বিহার

ভাসু বিহার বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শন। স্থানীয়রা একে **নরপতির ধাপ** হিসেবেও অভিহিত করে। এই প্রত্নস্থলে খননের ফলে পরবর্তী গুপ্তযুগের দুটি আয়তক্ষেত্রাকার বৌদ্ধ বিহার এবং একটি প্রায় ক্রুশাকৃতি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে।[১]

ভাসু বিহার, বগুড়া

ভাসু বিহারে বৌদ্ধ আশ্রম ভবনের ধ্বংসাবশেষ

আশ্রম ভবন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাইনবোর্ড

আকাশ থেকে ভাসু বিহার

অবস্থান[সম্পাদনা]

এটি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়, মহাস্থানগড় থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে বিহার ইউনিয়নের বিহার নামক গ্রামে অবস্থিত।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

ভাসুবিহার স্থানীয়ভাবে পরিচিত নরপতীর ধাপ নামে। এর অবস্থান শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার হাটে। এখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রথমবারের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয় এবং তা পরবর্তী দুই মৌসুম অব্যাহত থাকে। ধারণা করা হয়, এটি একটি বৌদ্ধ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ। খননকার্যের ফলে সেখানে ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমুর্তি, পোড়ামাটির ফলকসহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। তার ভ্রমণবিবরণীতে তিনি এটাকে 'পো-শি-পো' বা বিশ্ববিহার নামে উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভবত এটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশ আমলে ভাসুবিহারকে স্থানীয় মানুষরা 'ভুশ্‌বুবিহার' নামে আখ্যায়িত করেছে। বর্তমানে ভাসুবিহার অন্যতম পর্যটন স্পট হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

অবকাঠামো[সম্পাদনা]

খননের ফলে দুটি মধ্যম আকৃতির সংঘারাম এবং একটি মন্দিরের স্থাপত্তিক কাঠামো সহ প্রচুর প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। ছোট সংঘারামটির আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪৯ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪৬ মিটার। এর চার বাহুতে ভিক্ষুদের ২৬টি কক্ষ রয়েছে।[১] কক্ষগুলির সামনে চারদিকে ঘোরানো বারান্দা এবং পূর্ব বাহুর মাঝখানে প্রবেশ পথ আছে। বড় সংঘারামটি ছোটটির মতই দেখতে তবে এর আয়তন ও কক্ষ সংখ্যা বেশি। বড় আকারের একটি খোলা অংশকে ঘিরে এসব ছোট আকারের বৌদ্ধভিক্ষুদের আবাসকক্ষ। দেখে মনে হয় খোলা বড় অংশটি ছিল মিলনায়তন। যে মন্দিরের কাঠামো পাওয়া গেছে তার মাঝখানে বর্গাকার মণ্ডপ এবং চারপাশে ধাপে ধাপে উন্নিত প্রদক্ষিণ পথ আছে। এখানে প্রায় ৮০০ প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক ও সিলমোহর, মূল্যবান পাথরের গুটিকা, অলংকৃত ইট ও ফলক, মাটির প্রদীপ, পাত্রের টুকরা সহ অসংখ্য প্রত্নবস্তু।

পরশুরামের প্রাসাদ

পরশুরামের প্রাসাদ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ের সীমানা প্রাচীর বেষ্টনীর ভিতরে যেসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। স্থানীয়ভাবে এটি তথাকথিত হিন্দু নৃপতি পশুরামের প্যালেস নামে পরিচিত।[১]

ইতিহাস[সম্পাদনা]

১৯০৭, ১৯৬১ ও ১৯৯৫ সালে মোট তিন বার এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করে তিনটি নির্মাণ যুগের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৬১ সালে উপরিভাগের ইমারত ভেদ করে দুইটি গভীর খাদ খননের ফলে আরও দুইটি নির্মাণ যুগের ইমারতের ভগ্নাবশেষসহ বহুসংখ্যক উজ্জ্বল মৃৎপাত্রের টুকরা পাওয়া যায়। যা সুলতানি আমলের মৃৎপাত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাল ১৫শ/১৬শ শতকের বা সুলতানী আমলের বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ধারণা করেন। এছাড়া এখানে কোম্পানি আমলের (১৮৩৫-১৮৫৩) দুইটি মুদ্রা পাওয়া গেছে।

সুলতানী আমলের ইমারতের নিচে প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ইমারতের ভবনাবশেষসহ পোড়ামাটির চিত্রফলক, প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুপট্টের ভগ্নাংশ ও বহু কড়ি পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত স্থাপত্যের কাঠামো ও প্রত্নবস্তুর সাথে পাল আমলের কাঠামো ও প্রত্নবস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত এ সকল নিদর্শন থেকে ধারণা করা যায়, এখানে অষ্টক শতক বা পাল আমলের নির্মিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

অবকাঠামো[সম্পাদনা]

উপরের স্তরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত একটি বিরাট আবাস বাটির সম্পূর্ণ নকশা উন্মোচিত হয়েছে। অন্দর মহলে অবস্থিত ছোট একটি অঙ্গনের দিকে মুখ করে নির্মিত পৃথক পৃথক ৪টি মহল বা অংশের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মহলগুলোর প্রবেশ পথ সহ বেশ কিছু কক্ষ, সোপান শ্রেণী, সীমানা প্রাচীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আবিষ্কৃত হয়েছে। মুল প্রবেশদ্বার হচ্ছে পূর্ব পাশের প্রবেশদ্বার। যার দুই পাশে দুইটি প্রহরী কক্ষের নিদর্শন দেখা যায়। উপরিভাগে মোঘল ও ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত ছোট আকারে ইট, চুন সুরকির আস্তর, চুনকামের ব্যবহার, গঠনশৈলী ইত্যাদি দেখে অনুমান করা যায় যে, এই ইমারত অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল।